OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 73 - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তর-পূর্বের মানবী পাঠ : বাংলা ছোটগল্পে নীরব প্রান্তিকতার স্বরসন্ধান

ড. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি-৯. অসম. ভারত
Email ID: jyotirmoysg@pragjyotishcollege.ac.in
0009-0001-0855-3174

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Subaltern Silences, Nimnabarga, Marginality, Voices, Northeast India, Women Writers, Binary Relationship, Hegemony.

Abstract
Northeast India is a deeply diverse region whose unique geography and culture have profoundly shaped its literary landscape. Writers nurtured by this environment have consistently engaged with the lived realities of the marginalized populations inhabiting its fringes, bringing their stories into urban consciousness. While women remain central to gender-based subaltern discourse, twenty-first-century Bengali short stories from the Northeast have actively constructed a new understanding of womanhood. This study examines how selected Bengali women writers—who are intimately familiar with the region's socio-economic and cultural struggles—portray the lived experiences of the marginalized. We find that working-class individuals, housewives, and other figures living on the periphery— those whom Antonio Gramsci termed 'subalterns' or Ranajit Guha called the 'nimnabarga' - occupy a central place in these literary worlds. These subjects encompass domestic workers, day laborers, sex workers, tea-garden and tribal women, female detainees in camps labeled as Bangladeshis, and various other destitute or displaced individuals navigating everyday survival. Based on selected texts, this discussion examines how these marginalized individuals either surrender to the machinations of power or become compliant despite their convictions, ultimately exploring how they are defined as the 'subaltern' within the binary relationship between the hegemonic and the oppressed.

Discussion

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব বৈচিত্র্যে ভরপুর জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। উত্তর-পূর্বের জল-মাটি-আবহাওয়ায় লালিত লেখকেরা তাঁদের কথকতায় সেই বৈচিত্র্যের অন্তর্গত প্রান্তিক মানুষের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে নির্বিকার থাকেননি। নাগরিক মননে ধরা পড়েছে ব্রাত্যজীবনের জলছবিগুলো– চিহ্নিতকরণের রসায়নে যা স্ফুটতর। বর্তমান পরিসরে আমাদের সমস্ত প্রয়াস, বিশেষত নির্বাচিত নারীপাঠে, এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার আকলন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্রাত্যজীবন কথা হল সেইসব মানুষের কথকতা, যারা সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি, কাঠামো বা সুবিধা-বলয়ের বাইরে থাকে এবং যাদের জীবনচিত্র প্রভাবশালী ডিসকোর্সে অনুপস্থিত থাকে। এই অনুপস্থিতিকে চিহ্নিত করে চেনা জগতের অচেনা মানুষের হৃদয়ানুভূতি, মানসিক বৈকল্য, অন্তর্যন্ত্রণা, নির্জিত অন্ত্যজ জীবনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া বা পরিবর্তন সমাজ-পটভূমিতে বিশ্বাসযোগ্য করে ফুটিয়ে তোলার কথকতাই হতে পারে ব্রাত্যজীবনের গল্প। একটা সাধারণ ধারণা এই যে, প্রতাপনির্দিষ্ট লৈঙ্গিক রাজনীতির শিকার সমস্ত নিরালম্ব সত্তাই 'ব্রাত্য'। নারীই যে এর নিরতিশয় অবলম্বন তা না বললেও চলে। তবে শুধু লৈঙ্গিক রাজনীতির কথাই বা বলি কেন, ভাষা-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে আধিপত্যকামী বলয়ের বিপ্রতীপ পরিসরে ন্যুব্জ ও বিস্রস্ত সত্তামাত্রই বন্ধনীভুক্ত হবার যোগ্য। সেক্ষেত্রে অন্তেবাসীসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সত্তা সঙ্কটে বিপর্যস্ত নাগরিক বাঙালির চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবু বর্তমান পরিসরে আমরা আপাতত প্রান্তিক মানুষের বয়ানেই আবদ্ধ থাকব - যে বয়ানে একাধিপত্যের বিপরীতে ভূমিজ, দরিদ্র, আক্রান্ত, বিপন্নের বহুমাত্রিকতা সংলগ্ন। তদুপরি উত্তরপূর্বের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে নারীর একান্ত নিজস্ব পরিসর নির্মিতিতেই আপাতত আমাদের অচঞ্চল পদচারণা। এর অন্যতম কারণ হল, লৈঙ্গিক বিশ্বে নিম্নবর্গচর্চার অন্যতম আলম্বন যে নারী, একুশ শতকের দোরগোড়া থেকে উত্তরপূর্বের বাংলা গল্পের আঙিনায় তাঁদের নিয়েই নিরন্তর নারীপাঠ নির্মিতি। দ্বিতীয়ত, আমাদের এই উত্তরপূর্বে নারী-সত্তা নিরঙ্কুশ পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার করে লিখনবিশ্বে যে পদচারণা শুরু করে দিয়েছিলেন গত শতকেই, তার পর্যালোচনা সময়েরই দাবি। এই শতকের সিকিভাগ পেরিয়ে উত্তরপূর্ব জুড়ে বহুমুখী সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের যে আদল তৈরি হয়ে গেছে, তা এখানকার পিঞ্জরমুক্ত নারীর লেখনবিশ্বে সচেতন ভাবে যে জায়গা করে নেবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। এই ধরনের কথকতায় ব্রাত্যজনের স্বর প্রকট হয়ে ওঠাটাও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের একান্ত কাম্য।

উত্তরপূর্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনযন্ত্রণার প্রাত্যহিকতার সঙ্গে পরিচিত আমাদের নির্বাচিত লেখকসমাজ স্বরচিত বাংলা গল্পের পরিসরে কীভাবে ব্রাত্যজনের যাপিত জীবনকে শনাক্ত করেছেন, সেটা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখছি তাঁদের লিখনবিশ্বে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষ, গৃহবধূ বা অন্যান্য অন্তেবাসী মানুষ – আন্তোনিও গ্রামশির ভাষায় যারা 'সাবঅল্টার্ন' বা রণজিৎ গুহর 'নিম্নবর্গ'। তালিকায় থাকবে শহরের ঠিকে কাজের ঝি, চৌকিদার বা ফাই-ফরমাস খাটা মানুষ, দিনমজুর, ভিখিরি, দেহোপজীবিনী, নাপিত, বড়লোক বা মধ্যবিত্ত বাড়ির বাচ্চা সামলানো কম বয়সী মেয়ে, নার্স, রিকসাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ঢাকি, মালীর মেয়ে, চায়ের দোকানি, ছোটোখাটো ব্যবসা করে পেট চালানো মানুষ, রেলের ওয়াগন ব্রেকার, বাংলাদেশি তকমা নিয়ে ডিটেনশ্যন ক্যাম্পের মহিলা বন্দি, বিভিন্ন বয়সের অনাথ নিরাশ্রয় বা নিঃসঙ্গ মহিলা, শ্রমিকের স্ত্রী, কর্মরতা গৃহবধূ, গ্রামের ধাই, বাগানিয়া বা আদিবাসী মহিলা, গ্রামের ঘর-গেরস্তালি সামলানো মহিলা, ধোপানি, মুনিষ, রাখালবালক ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের নির্বাচিত লেখকসমাজ চারপাশের প্রান্তিক চরিত্রগুলোকে তাঁদের লিখনবিশ্বে জায়গা দিয়ে নির্মাণের মধ্যে যে বৈচিত্র্য এনেছেন তা অনস্বীকার্য। এঁদের মরমী লিখনে ধরা পড়েছে সমাজের অন্তেবাসী মানুষগুলোর কথা – সেই নির্মাণ আধিপত্যবাদী ব্যক্তিতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেহনতি মানুষ তথা নানা বয়সী নারীর একনিষ্ঠ যাপনচিত্র হয়ে ওঠার পাশাপাশি কখনও কখনও নিজস্ব জীবনযাপনজাত চৈতন্যের স্বর পরিস্ফুটনে ভাস্বর। কর্তৃত্বক্ষমতা ও আধিপত্যের নানা কৃৎকৌশলে নিম্নবর্গ হয়ে ওঠার যাত্রাপথে এঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলো গ্রাম-মফস্বল-নগর নির্বিশেষে উত্তরপূর্বের সমাজ প্রেক্ষিত থেকেই উঠে এসেছে।

জয়া গোয়ালার গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। আদিবাসী, খেটে খাওয়া মানুষ, মুনিষ, শ্রমিকদের নিয়ে এই লেখক বহু গল্প লিখেছেন। 'পারবতীয়া', 'ঝুমরি', 'জগ্গুর কথা', 'পরদেশী' ইত্যাদি গল্পের কথা আমাদের মনে পড়বে। তাঁর *মজুরী*[১] গল্পটি গড়ে উঠেছে বুড়ো বিষ্ণু তেলেঙ্গাকে নিয়ে। পাশাপাশি কয়েকটা অঞ্চল, যেমন তেলেঙ্গাপাড়া, ঘাটুয়াল, মুণ্ডাবস্তির দরিদ্র মানুষগুলো আশপাশের সাহা-রায়-পাল-বিশ্বাস ইত্যাদি তাবড় তাবড় ধানীজমির মালিকদের খেতে মুনিষের কাজ, কামলার কাজ করে দিন গুজরান করত। নিতাই-রামজনম-সুরেশ-কানাইদের সঙ্গে বিষ্ণুও মুনিষ খাটত আর কখনও ভিটের কলা-মুলো-লাউ ইত্যাদি বাজারে বেচে দু-পয়সা উপার্জন করত। কিন্তু কি মুনিষ খাটার মজুরি কি ভিটের ফসল বেচা – সবক্ষেত্রেই ওদের ঠকতে হত, ন্যায্য দাম বা মজুরি তারা কখনোই পায়নি। খেতের মালিকরা বা বাজারের বাবুরা যা দিয়েছে সেটাই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেছে। ক্ষমতাতন্ত্রের এই সর্বগ্রাসী আধিপত্যের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যই বিষ্ণুদের নিম্নবর্গ হিসাবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিহ্নিত করতে যথেষ্ট। কারণ মালিকপক্ষ সম্পর্কে তাদের অনুভব, "হেরা কইতে গেলে হামরার মা-বাপ। খাওন-পিন্দন সব হেরার দয়াত।"[২] কিন্তু এই গল্প এখানেই শেষ নয়। গ্রামের ভি.এল. ডব্লু আর স্কুলমাস্টারের সহায়তায় একসময় বিষ্ণুরা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানায়। সাময়িকভাবে মালিকপক্ষ তাদের দাবি মেনেও নেয়। কিন্তু বিষ্ণুদের মজুরি বৃদ্ধি করার সফল আন্দোলনের দেড়-কুড়ি অর্থাৎ তিরিশ বছর পর এখন তার বড়ো ছেলে শীর্ণ রোগজীর্ণ দেহে কোদাল হাতে বাবুদের জমিতে মুনিষ খাটতে বেরিয়ে যায়। আগের মতোই বাবুরা মর্জি মতো মজুরি দেয়, তাদের সমাজ থেকে ভুখমারী কখনও শেষ হয় না। এখানে এসে উচ্চবর্গ শ্রেণিসংস্কৃতির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সপ্রতিষ্ঠিত আর তাদের অপর হিসাবে বিষ্ণু নিম্নবর্গ।

গৌরী বর্মণের *শাঁখের করাত*[৩] গল্পটিতে আছে এক ভয়ঙ্কর নিপীড়নের ছবি। আগরতলা-অসম সংযোগী পাহাড়ি রাস্তার ধারে একটি পাহাড়ি মানুষের পরিবারে আছে সম্প্রুর মা, তাঁর দুই ছেলে সম্প্রু ও তিলহন এবং তাদের বৌ আর ডালাক-ডিপন-লুলু নামে তিনটি সন্তান। অন্যান্যদের মতো এরা শুয়োর, মুরগি প্রতিপালন করে। পাহাড়ের বাঁকে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে সব বাস-জিপ ইত্যাদি গাড়িগুলো যখন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে তখন মা-বাবা সহ এই পরিবারের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা জঙ্গল থেকে জোগাড় করে আনা তাজা ফলমূলের সঙ্গে মুরগি-টুরগিও ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। রোজগারের টাকা দিয়ে চাল কিনে রাখে নিজেদের খাবার জন্য। এহেন লৌকিক পরিবারের আস্তানায় একদিন গভীর রাতে বন্দুকধারী উগ্রপন্থীর দল এসে হানা দেয়। সম্প্রুদেরই রুজি-রোজগারে তারা দখল দেয় এবং বিনা প্রতিবাদে সমস্ত দাবি মানতে বাধ্য করে। ফিরে যাবার সময় প্রতিদান হিসাবে তারা ছোট্ট লুলুর হাতে কয়েকটা চকলেট আর সম্প্রুর মায়ের হাতে এক প্যাকেট দোমড়ানো বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে যায়। এটা গেল একতরফা দমননীতির প্রথম ভাগ। এরপর ভোরের দিকে আসে নিরাপত্তারক্ষীরা। তারা অনুসন্ধানের নামে যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল তা-তো নিলই সঙ্গে সম্প্রুকেও বেঁধে নিয়ে গেল। না হলে দখল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কেউ প্রতিবাদ করতে পারেনি, কারণ এই রক্ষীরাই তো আসলে নিয়মতন্ত্র – তারাই সিদ্ধান্ত, তারাই ক্ষমতাকেন্দ্র। এর বিপরীতে সম্প্রুর পরিবার বা অন্যান্য জনপদবাসী নিতান্তই সমর্পণ ও আনুগত্যপ্রবণ প্রান্তিক। ফলে এই সরল শ্রান্ত পাহাড়ি জনপদবাসীদের অন্তরে বাসা বাঁধে এক অদ্ভুত শীতলতা। শুধু ডালাক ও তার তিলহনের মনে বইতে থাকল অশান্তির ঝড়।

মীনাক্ষী সেনের *পরিত্রাণ*[৪] মমতার গল্প। তার পরিচয় একজন সাধারণ গ্রামীণ গৃহবধূ, স্বামীর তথা সংসারের ভালোমন্দের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখাই যার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু স্বামী তোফাজ্জেলের কাছে মমতা শুধু একটিমাত্র সুঠাম শরীর – অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাকে সম্ভোগ করা যায় স্বামিত্বের অধিকারেই। সেটা ছাড়া মমতাকে আর কোনো কাজেই প্রয়োজন নেই। সে শুধু চাহিদা পুরণের অংশীদার। উপরি হিসাবে ছেলেপুলেহীন স্ত্রীকে শাসন করতে বেত তো আছেই। নিরুপায় মমতার মধ্যে সেজন্য ভয়মিশ্রিত আনুগত্যের চেহারা প্রকট। সেই সূত্রেই উগ্রপন্থীদের অমতে সুরজ মিঞাকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ায় সে তোফাজ্জেলকে আগাম সতর্ক করেছিল। কিন্তু মমতা ভাবতে পারেনি যে কর্তৃস্বরের দমননীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে যাচ্ছে সে নিজেই। গভীর রাতে উগ্রপন্থীরা তোফাজ্জেলের বাড়িতে হানা দেয়। পুলিশের চর সুরজকে লুকিয়ে রাখার শাস্তি হিসাবে তোফাজ্জেলকে বেতের আঘাতে প্রতিহত করে এবং মমতাকে টেনে হিঁচড়ে খোলা মাঠের দিকে নিয়ে যায়। লেখক বলেছেন, -

> "যেন মমতার শরীর দখল করার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হবে জয়-পরাজয়। ঠিক হবে কে ভূমিপুত্র আর কে নয়।"[৫]

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা বিফল হয়ে ফিরে গেলেও মমতার সমস্যা বাড়ে। সে না বোঝাতে পারে স্বামীকে, না বোঝাতে পারে মহিলা কমিশনের সদস্যদের যে, সে ধর্ষিতা হয়নি। এরকম একটি ঘটনা ঘটলে নারী যে প্রতিরোধহীন ভাবে ধর্ষিতাই হবে, সেই প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তেরও শিকার সে – যতই নিজের ওপর আস্থা থাকুক তার। স্বামী, উগ্রপন্থীরা এবং মহিলা কমিশন – এই তিনটি লৈঙ্গিক শক্তিকেন্দ্রের কাছেই মমতা একটি অপর সত্তা – প্রান্তিক।

মাধুরী লোধের *ঝরঝরিয়ার ছোট্ট গল্প*-এ[৬] যাত্রীদের সুবিধার জন্য ছোটো একটি দোকান দিয়ে সংসার চালানো স্বামী-স্ত্রী নির্মল আর শেফালির কথা বলা হয়েছে। ত্রিপুরার বিলোনিয়া অঞ্চল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর একটি ছোটো জনবসতি ঝরঝরিয়া। তার বাস-আস্থানের গায়ে রুজি-রোজগার চালানোর জন্য দোকান দিয়েছিল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই দু-জন। দূরের যাত্রীদের চা-বিস্কুট বা গোপনে মদ যোগান দিয়ে দু-পয়সা এরা রোজগার করত। কিন্তু মাঝে মাঝেই সীমান্ত-পুলিসের চোখ রাঙানি, মারধর ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। সীমান্তে চোরাকারবার চলে, সবকিছু জেনেও পুলিশ নির্মল-শেফালির কাছেই চোরের হদিস চায়। দোকান ভেঙে দিয়ে, মদের ড্রাম খদ্দেরের সামনে ঢেলে ফেলে দিয়ে পুলিশ তাদের ওপর ক্ষমতা জাহির করে। অথচ তাদেরই বড়োবাবু রাতের বেলা এসে শেফালির কাছ থেকে মদ চেয়ে খান। এই সমস্ত উল্লেখে এটা স্পষ্ট যে সর্বহারা শ্রেণি ও শাসকতন্ত্রের দ্বৈত সম্পর্কে শেফালীরা অপরসত্তা। গল্পের শেষ ট্রিটমেন্টে প্রশ্নহীন আনুগত্যের বেড়াজাল ভেঙে উত্তরণ আভাসিত হলেও তা আসলে পরাধীন সত্তাই।

পদ্মশ্রী মজুমদারের *জুম* [৭] গল্পের গোমতী চরিত্রটি ব্রাত্য জীবনকথার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আদিবাসী এই রমণী গোমতী ক্ষমতাশীল ও ক্ষমতাহীনের দ্বৈত সম্পর্কে অপর সত্তা। রুজি বলতে বাজারে চোলাই মদ বিক্রি আর জুমখেত। কিন্তু ক্ষমতাকেন্দ্রের কৌশলে জুমের জন্য আগুন দেবার সরকারি অনুমতি মেলে না, অথচ জঙ্গলের কাঠ পাচার অবারিত। জুম খেত না করার জন্য সরকারি ভরতুকির ব্যবস্থা আছে কিন্তু ব্লক অফিসের তা অস্বীকার করেন। এই কৌশলের অন্যতম সহায়ক এক বাঙালিবাবু। সে প্রতি রাতে রেঞ্জারকে মদ খাইয়ে বা মেয়ে মানুষ জোগাড় করে দিয়ে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের গাছ কেটে বিক্রি করে দেয়। এহেন প্রভুশক্তি গোমতীর দারিদ্র্যকে হাতিয়ার করে তাকে সমর্পণে বাধ্য করে। একদিকে চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে সরকারি যন্ত্রের পেষণে ক্ষতবিক্ষত গোমতী নিজেকে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ছেলেকে সে বড়ো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারল কিনা, ওষুধ খাওয়াতে পারল কিনা, ছেলেটা বাঁচল কি না ইত্যাদি প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ত্রিপুরার আরও অনেক লেখকের গল্পেই বনধ্বংসের নিষ্ঠুর চেহারা ধরা পড়েছে এবং সেইসূত্রে ধরা পড়েছে আদিবাসীদের বিমানবায়নের নগ্ন রূপ। এই গল্পকারেরই *শ্মশান* [৮] গল্পে শহরে বাবুদের বাড়িতে কাজ করে জীবন নির্বাহ করা রানির কথা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে একদিকে মদ্যপ স্বামী অন্যদিকে মুখোশধারী বাবু – প্রতাপ সাম্রাজ্যের এই দুই অংশীদারের অধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে রানিকে।

কাজল দেমতা তাঁর গল্পগুলোতে বাগানিয়া জীবনের চালচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বাগানিয়া মানুষ ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের নানা ঘটনা, করম উৎসবের আনন্দ-বিষাদের সঙ্গে প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ককে পরম মমতায় বর্ণনা করেছেন। সেইসঙ্গে তাদের উত্তরণের চেষ্টাকেও গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রেণি হিসাবেই বাগানিয়ারা প্রান্তিক। তারা মহাজনদের মজুরি খাটে, মুনিষের কাজ করে, খেতে ধান বোনা, গোরুর রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব কাজই করে। কখনও-সখনও তারা শ্রেণিস্বার্থের উত্তরণে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করে। সেই রকমই একটি বিবৃতি পাওয়া যায় *জীবনযুদ্ধ* [৯] গল্পটিতে। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে বুধিয়া। আধিপত্যবাদী শক্তির আবর্তে পড়ে সে তলিয়ে না গেলেও সমাজের মেহনতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবেই বুধিয়া অন্তেবাসী। মা তাকে জন্ম দিয়েই মারা যায় আর বাবা দিনরাত হাঁড়িয়ায় মজে থাকে। তার লালন-পালন সবই বুড়ি ঠাকুমার হাতে। সে বাবুদের বাড়ির রাখাল। গোরু চরানো, ঠিক সময়ে তাদের খেতে দেওয়া আবার বাবুর বাড়িতে নিয়ে এসে সযত্নে বেঁধে রাখা ইত্যাদি তার কাজ। বয়স কিন্তু তার বেশি নয়, বারো। রোজ আসা-যাওয়ার পথে সে গ্রামের মাস্টারমশায়ের স্কুলে তারই সমবয়সী শুকরাম বা সনাতনদের পড়তে বা গল্প শুনতে দেখতে পায়। মাস্টারমশাই ওদেরকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গল্প শোনান। বুধিয়ার খুব আগ্রহ, কিন্তু সে মাস্টারের পাঠশালায় ভর্তি হতে পারে না। কারণ গোরু না চরালে বাবুর গোঁসা হবে, ঢেকি শাক বা কান্দা আলু না তুললে খাওয়াও হবে না। তাছাড়া বাবু তাকে বুঝিয়েছেন, -

> “সব কামটা সবাকার লাগিন নাই লাগে।”[১০]

গোরু চরানোই তার কাজ, স্কুলে পড়াটা নয়। প্রতাপ নির্দিষ্ট এই যে অচলায়তন তারই পাশে দাঁড়িয়ে বুধিয়ার মনে লেখাপড়া শেখার, করমবাবা বা যুদ্ধের গল্প শোনার আগ্রহ তৈরি হয়। গল্পটি বুধিয়ার অস্তিত্ব বিকাশের এই দিকটাতে আলো ফেলতে চাইছে, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অবস্থানকেও স্পষ্ট করেছে। কারণ মূলত তাদের জীবনচর্যা আবর্তিত হয় দু-মুঠো খাদ্যের সন্ধানেই। তাদের জীবনে যত স্বপ্নই থাকুক, শেষ পর্যন্ত এই মৌলিক চাহিদার কাছেই তাদের মাথানত করতে হয়। এটা বুঝিয়ে দিতেই মনিব ও মাস্টারের সম্মিলিত প্রতাপচক্র বুধিয়াকে বলতে পারে - ‘সব কামটা সবাকার লাগিন নাই লাগে।’

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে যাবে বিজয়া দেব *ভোজ*[১১] গল্পটির কথা। এই গল্পে ঠিকে কাজের লোক নিতাই, পঞ্চা ও তার ছেলে রামু। পেটের খিদের কাছে আর কোনো কিছুই বড়ো সত্য নয়। নিত্যদিনের জীবনসংগ্রামের গল্প এই *ভোজ*। বাবুর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কামলার কাজে লেগে যায় পঞ্চা ও নিতাই। ছোটো রামুও বাবা-কাকার সঙ্গে হাত লাগায়। কারণ বিয়েবাড়িতে ভালো ভালো খাবার পাওয়া যাবে। কিন্তু সারাদিন ময়লা ফেলা, জায়গা পরিষ্কার করা ইত্যাদির বদলে দিনের শেষে তারা চায়ের সঙ্গে মিস্টির বদলে পায় চপ। রামুর ভাই ঝড়ু কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছে, কিন্তু ওষুধ-পথ্য করার সম্বল নেই পঞ্চা বা নিতাইয়ের কাছে। নিজেদেরই খাবার জোটে না। অথচ বিয়েবাড়িতে অঢেল আয়োজন। যার জন্য এত আয়োজন, সেই বর আঙুলের মাথা দিয়ে তুলে খায়। অসহায় ভাবে রামু সেগুলো দেখে আর ভাবে, জ্বর কমলে তার ছোটে ভাইটা তার সঙ্গে খেতে আসতে পারবে। বিয়েবাড়ির মণ্ডপের কাছাকাছি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে রামুকে ঘুরঘুর করতে দেখে ঝাঁকড়াচুলো একটা ছেলে তাদের তাড়িয়ে দেয়। খিদে নিয়ে রামু বাড়ি ফিরে যায় আর স্বপ্ন দেখে মসৃণ ভাতের ওপর ডাল, মুড়ো, মাছ ইত্যাদি বিয়েবাড়ির সুস্বাদু খাবার নেমে আসছে। রাত বাড়লে যে ছেলেটা খাবার পরিবেশন করছিল তার সহায়তায় অসুস্থ ছোটো ভাই ঝড়ুর জন্য বিয়েবাড়ি থেকে মাংসের টুকরো নিয়ে এসেছিল রামু। কারণ ঝড়ু মাংস খেতে ভালবাসে। কিন্তু অসহায় ভাবে ঝড়ুর মৃত্যু তাকে দেখতে হয়। ঝড়ুর মৃত্যু তাকে বিচলিত করলেও খিদের জ্বালা মেটাতে মাংসের টুকরোটা ফেলে দেবে ভেবেও সেখান থেকে এক টুকরো খেয়েই ফেলে। মানবিকতা বোধ এই প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রায় থাকে না। নিতাইয়েরও ছিল না। নিকটাত্মীয় শিশু মরে গেলেও তার অনুশোচনা নেই। সে একেবারেই বাস্তব – সে জানে, গরিবের ঘরের বাচ্চাদের বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। এভাবে স্বল্প আঁচড়ে নিতাই ও রামুদের প্রান্তিক অবস্থানকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন লেখক। আর্থ-সমাজিক দুর্বলতাই তাদের এলিট প্রতিপক্ষ। মৌলিক চাহিদার কাছেই তাদের দলবদ্ধ সমর্পণ।

ঝুমুর পাণ্ডের *বিনতিবুড়ি, গাছগাছালি, শনখাড়ি পাহাড় এবং...*[১২] গল্পে বিনতিবুড়ি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ছোট্ট বাঁশ পাতায় ছাওয়া তার ঘর। কেউ নেই তার সংসারে, একাই থাকে। প্রতিবেশী হিসাবে আছে তরুলতা আর নগেন। বাপের সঙ্গে থাকত একসময় বিষাণপুরে। সেখানে তাদের সুপারি-লিচু-আম গাছ ছিল। সে বাগানে পাতা তোলার কাজ করত। রামলতান তার সঙ্গে ঘর বাঁধার আশ্বাস দিয়ে আর ফিরে আসেনি। ঘর বাঁধা বিনতির কাছে স্বপ্নই রয়ে যায়। ইতিমধ্যে বিষাণপুরে রেললাইন বসানোতে তাদের ভিটেটুকু চলে যায় সরকারের খাতায়। সরকার থেকে টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও সেটা পায়নি। তারপর চলে এসেছিল তারা শনখাড়ি পাহাড়ের পাশে জঙ্গলের ধারে। কিন্তু এখান থেকেও তাকে বিতাড়িত হতে হবে নতুন করে রেললাইন পাতার জন্যই। দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই এই বাস্তুহীন জীবন বয়ে নিয়ে যেতে হয় বিনতিবুড়ির মতো প্রান্তিক মানুষদের। শাসক ও শাসিতের দ্বৈত সম্পর্কে বিনতাবুড়ির মতো মানুষদের পরাধীনতা একরকম নিশ্চিতই।

স্বপ্না ভট্টাচার্য এরকমই এক সহায়হীন বৃদ্ধার করুণ কাহিনি শুনিয়েছেন তাঁর *রসকলি*[১৩] গল্পে। তারামণি লোকের বাড়িতে কাজ করে দিন গুজরান করে। বাড়িতে তার ছেলে হারাধন আর ছেলের বৌ রাখী। হারাধন মানুষ হয়নি। কেউ বলে ড্রাগস্ খায় বা এসবের ব্যবসা করে, কেউ বলে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। যে কারণেই হোক, হারাধন বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট ছিল। সেসময় তারামণিকেই লোকের বাড়িতে কাজ করে নিজের ও ছেলের বৌয়ের পেট চালাতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে তার মেয়ে তাকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখার কথা বললেও বুড়ি যায়নি। নিরুদ্দেশ ছেলের ঘরে ফেরার আশায় বসে ছিল। কিন্তু ছেলে ফিরে আসার পর তারামণিকে ছেলে-বউয়ের মানসিক ও শারীরীক অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়। কারণ ছেলে চায় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তারামণির সামান্য কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে। মনের দুঃখে তারামণি দালাল ধরে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে মেয়ের কাছে চলে যাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু তার আশা ফলবতী হতে পারে না। দালাল লোকটি তাকে ঠকায়। কাগজের খবর অনুযায়ী সুতারকান্দি বর্ডারে গণধর্ষিতা তারামণিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই কাহিনিতে পরিবার ও সমাজ বিচ্ছিন্না তারামণির প্রান্তিক অবস্থান স্পষ্ট।

শর্মিলা দত্তের অনেক গল্পেই সমাজের প্রান্তিক মানুষদের দেখা পাওয়া যায়। যেমন ভাগবতী নুনিয়া, অমল বা ভৈরব। তাঁর *খেটে খাওয়া ঈশ্বর*[১৪] গল্পেই আছে শিবের ভেক ধরে গাজনের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করা ভৈরবের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথা। এটা তার আসল নাম না হলেও এই নামেই সবার কাছে সে পরিচিত। সাত-আট বছর বয়সে শিমুলতলার ভৈরববাবার থানে তাকে গড়ে তুলেছিলেন সনাতন মাস্টার আর অন্নদা সন্ন্যাসী। তখন থেকেই তার নাম হয়ে যায় ভৈরব। গাজনের সময় রঙ মেখে শিব-কালী সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় আর ভিক্ষে করে। এই দুজনেই তাকে চাষি-শিবের গল্প শুনিয়ে তার মনকে গড়ে তুলেছিলেন। বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখে শহরের ফ্ল্যাট-সংস্কৃতিতে তার ওই শিব-গৌরীর নাচ বড়োই বেমানান। মন্দিরে যে শিবঠাকুর বসে আছেন তাঁর প্রতি লোকের যেমন ভক্তি তেমনি তার মতো ঘুরে বেড়ানো শিবের প্রতি মোটেও নয়। ফলে ভৈরবকে পায়ার ঘাম মাথায় ফেলে কঠিন পরিশ্রমে দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে হয়। ছোটোবেলায় দেখা বছিত আলি, যে কঠিন পরিশ্রমে ডহর থেকে মাছ ধরত, মিছিলের মধ্যমণি শ্রমিকের দল – যাদের অধিকারের দাবিতে অনেকেই সরব – ভৈরব তাদের সঙ্গে নিজেকে মেলায়। তার মনে হয়, ওদের মতো সেও তো গতরখাটা শ্রমিক। ঈশ্বরকে মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে দিতে নেচে-গেয়ে, গায়ে রঙ মেখে ঘুরে বেড়ালেও সে সর্বকালের ব্রাত্য। কেউ তাকে ভিক্ষে বা টাকা-পয়সা দিতে চায় না, অথচ মন্দিরে গিয়ে একই শিবঠাকুরকে ভক্তি করে। মন্দিরের সেই শিবঠাকুর তার মতো পরিশ্রম না করেই কত টাকা রোজগার করে। মনে এইসব প্রশ্ন দেখা দিলেও মাস্টার মশাইয়ের শেখানো কথা অনুসরণ করে সে ঈশ্বরের শ্রমিক হিসাবে ছুটে বেড়াতে থাকে। কারণ কর্তৃস্বর সেভাবেই তাকে গড়ে উঠতে শিখিয়েছে। এইভাবে গল্পের বয়ানে ভৈরব হয়ে ওঠে প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা।

মেঘমালা দে মহন্তর *এক গোলাপি সন্ধ্যায়* [১৫] গল্পের গোলাপি দেহপোজীবিনী। কলগার্ল বলাই সঙ্গত। বিভিন্ন খদ্দেরের ডাকে সে বিভিন্ন জায়গায় যায়। গল্পের শেষে গল্পকথক মাহিল মেয়েটিকে দুশোটাকা এগিয়ে দিলে সে ভাবে শহরে এটা বোধহয় নতুন ফ্যাসান এসেছে যেখানে শুধু পুরুষ নয় নারীরাও টাকা দিয়ে সঙ্গী খোঁজে। এই দেহোপজীবিনী মেয়েটি ঠিক তার চোখ দিয়েই চারপাশের জগতটাকে দেখেছে, যেটা একান্তই স্বাভাবিক। তাছাড়া পিতৃতান্ত্রিক তথা ভোগবাদী সমাজে কীভাবে এই ধরনের বৃত্তিজীবীরা জন্ম নেয়, কোন প্রয়োজনে, তারও একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায় লেখকের এই বয়ানে। প্রতাপচক্রের কবলে পড়ে এইভাবে কতই না প্রান্তিক অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে নাগরিকের, তা লেখকের এই বয়ান পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই লেখকের ঝুলিতে আরও বিচিত্র রূপে প্রান্তবাসীদের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন, জীবন সংগ্রামের এক নতুন বাঁকে 'এনার্জি তাবিজ' বিক্রি করা নিতাই দাস[১৬] বা চৈত্র মাসে গাজনের সময় শিবের ভূমিকায় বালক রামাইয়া।[১৭] কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গেছে সালেমা বেগম।[১৮] নাগরিকতা যাচাইয়ের অলাতচক্রে পড়ে সালেমা বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত এবং বেশ কয়েকটা জেল ঘুরে এখন একটি ডিটেনশন ক্যাম্পের বাসিন্দা। তার বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি বিদেশির নোটিস পান এবং প্রশাসন তাঁকে জেলে নিয়ে গেলে আতঙ্কে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন থেকেই সালেমাদের জীবনে সব ওলটপালট হয়ে যায়। এরপর সালেমার পালা। সেও নোটিস পায়। পাড়াপ্রতিবেশীরা তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে, অর্থাৎ সন্দেহের আবর্তে ফেলে দেয় – শুরু হয় সালেমার ব্রাত্যজীবন পর্ব। লেখক জেল বা ক্যাম্পে থাকাকালীন সালেমার তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনি দু-একটি আঁচড়ে স্পষ্ট করেছেন। প্রতাপের ভেলকিতে বাইরের জগতে সালেমার পরিচয় এক 'বাংলাদেশি' বা অনাগরিক – আর জেলের ভেতর সে পুরুষ রক্ষীদের কামনার জালে বন্দি। এই ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে দ্বৈত সম্পর্কে সে অপর।

তমা বর্মণের *মারীচরাত্রি* [১৯] গল্পে নগরজীবনের একটি অন্ধকার দিকের ওপর আলো ফেলা হয়েছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে দুর্বল একটি শ্রেণির দেহোপজীবিনী হয়ে ওঠার গল্প এটা নয়, বরং ওই কৃষ্ণ ঘেরাটোপে আবদ্ধ এবং ক্ষমতাকেন্দ্রের নিষ্ঠুরতায় ক্ষত-বিক্ষত নারী হৃদয়ের যন্ত্রণা এখানে স্পষ্ট। মাসির তত্ত্বাবধানে যে বেশ্যালয়টি চলে, বিভিন্ন যায়গা থেকে মূলত ট্রাক ড্রাইভাররা সেখানে যায়। তারাই খদ্দের। অন্যান্যদের সঙ্গে কৃষ্ণাকেও সেই খদ্দের সামলাতে হয়, যতই শরীর খারাপ থাকুক। ক্ষমতাকেন্দ্রের প্রধান হিসাবে মাসি এখানে নিয়ন্ত্রক – সে যা বলবে, অসুবিধে হলেও তাকেই মানতে হয় কৃষ্ণাদের – এমনকী নতুন আসা মেয়ে রত্নাকেও। কৃষ্ণা সারাশরীরে ব্যথা এবং জ্বর গায়ে শুয়ে থাকলেও প্রভুত্ববাদী মাসি রত্নাকে খবর নিতে পাঠায় এটা জানতে যে সে খদ্দের সামলাতে পারবে কি পারবে না। এই পরিসরে কৃষ্ণার সন্তান বিট্টু বড় হতে থাকে, যার পরিণাম গুণ্ডা-বদমাস হওয়া, যতই কৃষ্ণার বা বিট্টুর নিজেরও অন্য স্বপ্ন থাকুক। চিহ্নিতকরণ পর্যায়ে এভাবেই কৃষ্ণাদের প্রান্তিক অবস্থান ফুটিয়ে তোলেন লেখক।

মঞ্জরী হীরামণি রায়ের *ঠোক্কর* [২০] গল্পে উঠে এসেছে দিনমজুর ও ঠিকে কাজের ঝি-দের কথা। নজমূলকে ঠেলা চালিয়ে বা দৈনিক হাজিরা করে পেট চালাতে হয়। তার স্ত্রী জরিনা লোকের বাড়িতে রান্নাবান্না সহ ঠিকে কাজ করে। পবিত্র রমজান মাসে যখন সবাই ধর্মীয় নিয়ম পালন করে, তখন পেটের দায়েই এদের দুজন কাজে কামাই করতে পারে না। নজমূলকে চৌধুরীদের বাড়িতে ঠেলায় করে মাটি ফেলতে হয়, জারিনাকেও মালিকের বাড়িতে রমজানের সব রান্না করে রাখতে হয়। দুটো পয়সা বেশি রোজগারের জন্য নজমূলের তিনটি ছোটো ছোটো ছেলেই মাটি বয়ে নিয়ে যেতে বাবাকে সাহয্য করে। ফলে স্কুলে ঠিক সময়ে হাজির হতে পারে না – স্কুল থেকে দুপুরের খাবারটাও জোটে না। ওদিকে জরিনা যদিও জানে যে, ঘরে অন্তত ভাতের জোগাড় না থাকলে ধর্মের নিয়মকানুন মানা বৃথা – তবু মালিকের আধুনিকা স্ত্রী রমজান মাসে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ না পড়ার জন্য তাকে দোজখে যাবার ভয় দেখান। তিমি নিজে নিয়ম করে রমজান মাসের রোজা রাখবেন কিন্তু জরিনাকে ছুটি না দিয়ে রাঁধাবেন, যাতে পরম শান্তিতে তাঁরা ইফতার করতে পারেন। স্বধর্মী দুই নারীর এই বিপরীত অবস্থান জরিনাকে প্রান্তিক মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করে।

আদিমা মজুমদারের গল্প *লকডাউনের শেষ দিন।* [২১] জীবনলাল পেশায় নাপিত। কোভিডে মা-কে হারানোর খবর পেয়েও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। লকডাউন উঠে যাওয়ায় এবার সে বিহার যাবে। লকডাউনের সময় সে চাল-ডাল পেয়েছিল চৌধুরীবাবুর বদান্যতায়, এজন্য তার আচরণে কৃতজ্ঞতার ছাপ। সে বিহারে তার গ্রামের বাড়িতে ভাই-বোনের কাছে ফেরার জন্য স্টেশনে টিকিট কাটতে যাবে শুনে চৌধুরী বাধা দেন। তিনি বলেন যে, তাঁর ছেলে নাহয় অনলাইনে টিকিট কেটে দেবে, কিন্তু এখন সে যেন তাঁর বাড়িতে এসে চুল-দাড়ি কেটে দেয়। জীবনলালের মতো প্রান্তিক মানুষদের নিজস্বতা বলে কিছু থাকতে নেই, যার নুন খেয়েছে সেই প্রতাপপ্রপঞ্চের শিকার হওয়াই তাদের ভবিতব্য। তাই চৌধুরীবাবুর নির্দেশ অমান্য করতে না পেরে মাঝপথ থেকে তাকে ঘরে ফিরে গিয়ে ছুরি-কাঁচি নিয়ে তাঁদের বাড়িতে চলে যেতে হয়। এখানেই শেষ নয়, কোয়ারেনটাইনে চোদ্দ দিন থাকতে হতে পারে, এই আশঙ্কার কথা শুনিয়ে জীবনলালকে ভীতিগ্রস্ত করার চেষ্টাও হয় চৌধুরীর তরফ থেকে -- এখনই দেশে ফিরতে জীবনকে বারণ করেন চৌধুরী। এভাবেই গল্পে জীবনলাল চিহ্নিত হয়ে যায় নিম্নবর্গ হিসাবে। ক্ষমতাকেন্দ্রের অধিকারী চৌধুরীর কাছে তার সমর্পণ ও আনুগত্য এখানে স্পষ্ট।

অর্পিতা আচার্যর *ওরা দুজন এবং অনেকে* [২২] গল্পে ঈশান দিন হাজিরা হিসাবে বিদ্যুৎ দেববর্মার বাড়িতে বেড়া দেবার কাজ করতে এসেছে। স্বগোত্রীয় লোক হলেও অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ভাবে এক গোত্রের মানুষ হলেও অর্থনৈতিক কৌলীন্য কীভাবে তাদের বর্গবিভাজিত করে তার অন্যতম পরিচয় আছে এই গল্পে। বিদ্যুৎ সরকারি কর্মচারি, তার স্ত্রী প্রভাও চাকরি করে – আগরতলা শহরের একটি সম্পন্ন পরিবার। বাড়ির ছোটো বাচ্চাকে পুকুরে পড়ে যাওয়া আর বাগানের ফসলগুলো গোরু-ছাগলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উঁচু এবং শক্ত করে বাঁশের বেড়া দিতে সে বাজার থেকে ঈশান ও পবিত্রকে ধরে এনেছে। ঈশান বিদ্যুৎকে দেখে চিনতে পারে – সে তাদেরই গ্রামের স্বগোত্রীয় রাজেন দেববর্মার ছেলে। লেখাপড়া শিখে বিদ্যুৎ সরকারি কর্মচারি আর ঈশান আজ রুজি-রোজগারের টানে তারই বাড়ির দোরগোড়ায় বসে। কাজের খোঁজে সঙ্গী পবিত্রকে নিয়ে সে আজকে এ-বাজার কাল অন্য বাজারে গিয়ে বসে। চেনা মানুষ দেখে বিদ্যুৎ তাদের নিয়ে এসেছে। সুতরাং ঈশানেরা মনে মনে ভাবে চেনা মানুষ বলেই বিদ্যুতের বাড়িতে দুপুরে ভাত খেতে পারবে। কিন্তু টিফিনে তাদের দেওয়া হয় শুকনো রুটি, চিনি আর চা। সেটাকেই ঈশান 'আদরে ভোজন কী করে ব্যঞ্জন' এই আপ্তবাক্য মেনে পরম তৃপ্তিতে খায়। সারাদিন ধরে তারা বিদ্যুতের নির্দেশনা অনুযায়ী বেড়া বাঁধে। এরপর পড়ন্ত বিকেলে প্রভা বাড়ি ফিরে এসে ঈশানদের কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। গেট তখনও দেওয়া হয়নি – সে ঈশানদের গেটটা তৈরি করে লাগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। সন্ধ্যে হয় দেখে ঈশানেরা মৃদুভাবে বলে যে পরের দিন কাজটা করে দেবে। কিন্তু প্রভা জোর করেই কাজটা করিয়ে নেয়। কিন্তু সারাদিনের মজুরি হিসাবে বিদ্যুৎ ঈশানের হাতে তিরিশ টাকা গুঁজে দেয়। তারা যদিও বলে যে মজুরি পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে, কিন্তু বিদ্যুৎ বা প্রভা দেয় না। যে প্রভা কাজ শেষে ঈশানদের আরেকবার চা-খাওয়ানোর কথা বলায় বিশ্রীভাবে স্বামীকে নিষেধ করে, সে-ই পঞ্চাশ টাকা মজুরি দেবার প্রসঙ্গে মেকি আপনত্ব জাহির করে বলে, -

"আপনারা ঘরের লোক হয়ে একথা কেন বলছেন। তিরিশ টাকা তো ঠিকই আছে।"[২৩]

এটা বর্গ বিভাজিত সমাজ তথা প্রতাপচক্রের সুবিন্যস্ত বয়ান। যত নিকট সম্বন্ধই হোক না কেন, অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল মানুষের প্রান্তিক অবস্থান এভাবেই নির্দিষ্ট হয়। সর্বার্থে আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে মাথা নোয়ানোই ঈশানের মতো অন্তেবাসী মানুষের ভবিতব্য।

অঞ্জলি সেনগুপ্তর গল্প *কাঁটাতারের বেড়া, ভাতমুখ এবং...*[২৪] গল্পে কনা আদৌ প্রন্তিক মানুষ ছিল না. বরং পরিবেশ তাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার বাবা তাকে মদ বেচতে, মদের ঠেক তৈরি করতে বাধ্য করেছিল, প্রশাসন তাকে সেই লাভজনক ব্যবসায় সাহায্য করেছিল আর তথাকথিত ভদ্র সমাজ তাকে নষ্ট মেয়ে, ছেনাল মাগী ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করে সমাজের এককোণে ঠেলে ফেলেছিল। এ-গল্প তাই হয়ে উঠেছে কণা নামের একটি শিক্ষিত অথচ নষ্ট-মেয়ের উপাখ্যান। আপাতভাবে গল্পে সীমান্ত-চোরাইচক্র, চক্রী, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী-ব্যবসায়ী ও কাঁটাতারের বেড়া ইত্যাদির পাশে প্রেমের ধর্মহীনতা বিষয়গুলো আলোচিত। কিন্তু আমাদের মনে হয় কণারা সবসময়েই সমাজের এঁটোকাঁটা, একমাত্র রূপ-যৌবন আছে বলেই ভোগ্য সামগ্রী – সেটা কণার পঙ্গু বাপ মন্দারই হোক, থানার বড়োবাবুই হোক, পাড়ার লোভী মাতব্বররাই হোক বা নিখাদ প্রেমিক বাংলাদেশী ইরফানই হোক। কণা একটা পরিবারের মুখের ভাত জোগায়, সেটা কিন্তু কোনো পক্ষের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের কাছে একমাত্র সত্য কণার রূপের দখলিসত্ত্ব। তাই মদ বেচনেওয়ালি কণার মর্মান্তিক পরিণতি এই গল্পের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়। খানিকটা অসচেতনভাবে হলেও অঞ্জলি এই গল্পে আসলে ব্রাত্য জীবনেরই রূপকার।

এযাবৎ আলোচনায় নিম্নবর্গ বা সাবঅল্টার্নের দায়রায় নারীর উপস্থিতি উজ্জ্বল এবং যে চরিত্রেরা আলোচিত তারা যুগপৎ নারী এবং জীবিকা, শ্রম তথা জীবনধারণ সূত্রে লোকায়ত। যদিও পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় সবনারীই একদিক দিয়ে নিম্নবর্গ, তবু স্বীকার্য যে, লিঙ্গসাম্যের আবহে তাঁদের অনেকেরই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক অবস্থান পাল্টায়। কিন্তু নাগরিক যাপনে অভ্যস্ত যে নারীরা পিতৃতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করে পারিবারিক অথবা কর্মজীবনে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন – আমাদের নির্বাচিত লেখকেরা পাঠকৃতিতে তাঁদের অস্বীকার করেননি। যেখানে পরিবেশ পরিস্থিতি সাপেক্ষে নারীর অধীনতা প্রত্যক্ষ, কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার পদ্ধতিগত বহিঃপ্রকাশ যেখানে স্বতঃসিদ্ধ, সেখানেই শ্রেণি-জাতি-সম্প্রদায় নির্বেশেষে তাঁরা নিম্নবর্গ। তাঁদের কথাও উত্তরপূর্বের বিচিত্র বয়ানে জায়গা করে নিয়েছে।

যেমন ধরুন শর্মিলী দেব কানুনগোর *অভীপ্সা* [২৫] গল্পের কথক চরিত্রটি। এ গল্পে কথক নিজেও এক নারী। বিবাহিতা, সন্তানের মা কিন্তু নিঃসঙ্গ। এমনকী জ্বর হলেও তাঁকে দেখবার মতো কেউ নেই। অথচ ‘ছেলেটি ভালো, ভদ্র ... খুব ভালো থাকবি তুই’[২৬] ইত্যাদি বলে তার অমতেই বাড়ির লোকেরা গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিলেন শৌনকের সঙ্গে। অথচ শৌনকের সঙ্গে তার রুচির আমেরু বিপ্রতীপতা। সে ব্যর্থ প্রেমের নায়কের সঙ্গে কল্পনায় মিলিত হয়, তার সঙ্গী বলতে একমাত্র ক্যালেন্ডারের অনাম্নী বালিকা – যাকে সে ছোটোবেলা থেকেই দেখেছে, জেনেছে নয়নতারা নামে। নিয়ত অবহেলিত, নিপীড়িত কথকের সংকটের ছবি এই গল্পে তীব্রভাবেই উচ্চারিত। অবহেলা যে শুধু স্বামী বা কন্যার কাছ থেকে তা নয়, ছোটোবেলায় মায়ের কাছ থেকে, বড়োবেলায় কাকিমার কাছ থেকে সে পেয়েছে। তার একাকী জীবনের দ্বান্দ্বিকতা আর অস্তিত্বের লড়াই পরিবারের সঙ্গে যতটা তার চেয়ে বেশি নিজের সঙ্গেই – বলা ভালো নিজেরই গড়ে নেওয়া আরেকটি স্বসত্তার সঙ্গে – যাকে সে দেখে আয়নাতে।

দোলনচাঁপা দাসপালের *শাড়ি* [২৭] গল্পে গার্হস্থ্য ক্ষমতাকেন্দ্রের ছবি ফুটে উঠেছে সুনয়নার অভিজ্ঞতায়। সুশোভনের স্ত্রী হয়ে যে পরিবারে সে এসেছিল সেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বদলে যৌথ বিচার বিবেচনা বেশি গুরুত্ব পায়। ‘যৌথ’ শব্দটির বৃত্তে থাকেন জা এবং বিধবা ননাস। তাঁদের শাসনে কুঁকড়ে থাকতে হয় সুনয়নাকে। বড়ো ননাস বিধবা হবার পর বাপের বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন এবং তিনিই ভাই ও ভাইয়ের বউদের ওপর প্রতাপ খাটিয়ে চলেন। এহেন পরিবেশে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে সুনয়না কোনোদিনই বড়ো করে দেখতে পারেনি। এমনকী তাঁর স্বামী সুশোভনও এই ক্ষমতাবৃত্তকে অস্বীকার করতে পারে না এবং কোনো প্রতিরোধী সত্তাও গড়ে তোলে না। ফলে যেমন নিজের ছেলেকে বাইরে পড়তে পাঠানো নিয়ে, তেমনি সংসারের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। স্বামীর আপোষকামী মনোভাবকে সুনয়নার চারিত্রিক ব্যর্থতা বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু নিজেও কোনো প্রতিবাদী পদক্ষেপ নিতে পারে না। বরং সেও নানাভাবে

আপোষকামী মনোভাবই নেয় জীবনযাপনে স্থিতাবস্থাকে ধরে রাখতে। ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে সুশোভন স্ত্রীকে একটি দামি শাড়ি কিনে দিলে জা-ননদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মুখোমুখি হতে হয় সুনয়নাকে। শাড়ি দেখে বড়ো-জা পূর্ণিমার গলায় হতাশার সুর আর বিধবা ননাসের বাক্যবানে ঈর্ষার সুর ফুটে ওঠে। সুনয়না নিজে তো নয়ই এমনকী সুশোভনও তাদের কথার কোনো প্রতিবাদ না করে শাড়িটা সুনয়নার বাপের বাড়ির দেওয়া বলে মিথ্যে কথা বলে। এভাবে আসলে ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে তাদের আত্মসমর্পণমূলক সম্পর্ক স্পষ্ট করে তোলে। এই গল্পের বয়ান সম্পূর্ণভাবে নিম্নবর্গ চেতনাকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে না পারলেও, লেখক এই ছোট্ট বিবরণে ক্ষমতাকেন্দ্রের বৈষম্য ও মানসিক নিপীড়নের ছবি তুলে ধরার ভেতর দিয়ে সুনয়না যে সামাজিকভাবে প্রান্তিক, তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

আমাদের সমাজে এমন বহু নারী আছেন যাঁকে পরিবার এবং কর্মস্থল – দুটোকেই সামলে চলতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বিতীয় জনকেই নানা বাধানিষেধের মুখোমুখি হতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে বিজয়া দেব লিখেছেন *রুচিরার দিনরাত্রি* [২৮] গল্পটি। এখানে রুচিরা একটি স্কুলে করণিকের কাজ করে। বিয়ের পাঁচ বছর পরও সন্তান আসেনি তার কোলে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'র সূত্রধরে তিন বছরের উদ্বেগপর্ব কাটাবার পর একদিন শাশুড়িই ছেলেকে ডিভোর্স দেবার জন্য চাপ দেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে ডিভোর্স দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে না পারলেও নানা ছুতোয় বিনায়ক স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব জাহির করতে ছাড়ত না। রুচিরার আয়ের টাকা সংসারে খরচ হয়, তাই সবসময় শাশুড়ি শাসন করতে পারেন না। কিন্তু সুযোগ পেলেই দু-কথা বলতেও ছাড়েন না। ননদের মঙ্গলের জন্য আয়োজিত পুজোয় রুচিরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই থাকেনি, এটাই সাব্যস্ত করতে চান তাঁরা সবাই মিলে। অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষও যাবতীয় কাজ চাপিয়ে দেন রুচিরার ওপর। তার আচরণকে অনাবশ্যক মনে হওয়ায় হেডমাস্টার রুচিরাকে ধমকও দেন। এভাবে রুচিরা ঘর ও কর্মস্থলে পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রেই প্রান্তিক অবস্থানে পৌঁছে যায়। ক্ষমতাকেন্দ্র তাকে স্কুলে এবং বাড়িতে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। স্কুলে কাজ থাকলেও রুচিরাকে ননদের মঙ্গলার্থে আয়োজিত পুজোর কাজ করার জন্য ছুটি নিতে বলা, সে পুজোর সময় না থাকতে পারায় বা পুজোর প্রসাদ খাবার আগে বাইরে রুটি-ঘুগনি খেয়ে ফেলায় পুজোতে ত্রুটি হয়েছে বলা বা সে ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও তাকে স্কুলে ডেকে পাঠানো এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতেই সাহস দেখাতে না পারলে ফালতু হাসতে বারণ করা ইত্যাদি উল্লেখে সচেতনভাবে কর্তৃত্বকামী সমাজ রুচিরাকে প্রান্তিক নারী হিসাবে চিহ্নিত করে।

এগুলো আসলে প্রান্তিক মানুষের ওপর ব্যক্তিতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপচক্রের শাসন ও শোষণের বয়ান। সমস্ত পাঠেই 'এলিট' ও 'সাবঅল্টার্ন'-এর বিপ্রতীপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন চরিত্রের প্রান্তিক অবস্থানও স্পষ্ট। বিভিন্ন গল্পে বিদ্যমান ক্ষমতাকেন্দ্র বা প্রতাপচক্র নানা পরিসরে মর্যাদা বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দিয়ে বা সমর্পণ ও আনুগত্যকে প্রধান্য দিয়ে নিম্নবর্গের অনুপস্থিতি স্পষ্ট করেছে। তাদের সত্তার উত্তরণ বা স্বরূপ উন্মোচনের কোনো সদিচ্ছা তারা প্রকাশ করেনি। এই নীরবতার জায়গাগুলোই আসলে বয়ানের অন্তর্গত ক্ষমতাতন্ত্রের প্রণালীবদ্ধ নিপীড়ন এবং বর্জনের প্রমাণ। লেখকদের বয়ানে এই নীরবতার জায়গাগুলো আছে বলেই তা নিম্নবর্গীয় আখ্যান হয়ে ওঠার উপযোগী পরিসর তৈরি করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সমাজের খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত বা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অন্ত্যজ শ্রেণি বা সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অপাংক্তেয় অথবা শ্রেণি নির্বশেষে বিভিন্ন বয়সের নারীর সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা-ভালোবাসার বিবরণ মাত্রেই ব্রাত্য জীবনের কথকতা বা নিম্নবর্গ নির্মাণ হতে পারে না। নিম্নবর্গের চরিত্রগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, বর্গ চিহ্নিত পরিবেশ, প্রতাপচক্রের নানা কূট সম্পর্কে এই শ্রেণির সংযোগ, অস্বীকৃতি ও নানামুখী প্রত্যাহ্বান, তাদের উত্থান-পতনের খতিয়ান এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা সামূহিক স্বরের প্রকাশই একমাত্র তাকে নিম্নবর্গ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে – শিল্প হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। এই প্রেক্ষিত থেকে আমরা বৃহত্তর অর্থে লিঙ্গ-জাতি-সম্প্রদায়-সংস্কৃতি নির্বিশেষে যেকোনো মানুষকেই নিম্নবর্গ বৃত্তে সামিল করতে পারি। আমাদের বিচারে, নির্দিষ্ট বয়ানের ঘটনাক্রম ও পরিবেশে, প্রতাপপ্রপঞ্চের সূক্ষতম আড়াল সত্ত্বেও, লেখক বর্ণিত চরিত্রটি ক্ষমতাকাঠামোর দ্বারা অস্বীকৃত বা ভুলভাবে উপস্থাপিত হওয়ার উপরিও নিয়ন্ত্রিত তথা নিপীড়ন ও বর্জনের শিকার হয়, তবে সেই চরিত্রই হবে নিম্নবর্গ বা 'সাবঅল্টার্ন'। পাঠ বিশ্লেষণে এর সঙ্গে আর যে মাত্রাটি যোগ হবে, তা হল বয়ানে নিম্নবর্গের প্রকাশ্য তথা সূক্ষ্ম প্রতিরোধী স্বর উপস্থাপনায় লেখকের সচেতনতা। এই সমস্ত কিছু মিলিয়েই তৈরি হতে পারে নিম্নবর্গীয় চেতনা। বর্তমান আলোচনায় আমরা আপাতত সমাজের প্রান্তিক

মানুষের জীবনচিত্রকে তুলে ধরেছি। ক্ষমতাকেন্দ্র কোথায়, কীভাবে এই ব্রাত্যজনের মর্মচেতনাকে অস্বীকৃতির ভেতর দিয়ে ধ্বস্ত করতে চেয়েছে, তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখন সমাজের ব্রাত্যজন বা অন্তেবাসী মানুষদের অন্তর্নিহিত জগৎকে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব স্থিতি সম্পর্কে বিশ্বাস, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদের ইতিহাসকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে কি না, সেটার সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা করে নিতে চাইব।

মীনাক্ষী সেনের *পরিত্রাণ* [২৯] গল্পে মমতার কথা আগেও আলোচিত হয়েছে। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষ্যের বিরুদ্ধে মমতা যে নতুন ভাষ্য তৈরি করেছে, সেটা লক্ষণীয়। গল্পটিতে কর্তৃস্বর শুধু যে স্বামী তোফাজ্জেলে বা রাতের অন্ধকারে যারা তোফাজ্জেলকে শাস্তি দিতে এসে মমতাকেই ধর্ষণ করতে চেয়েছিল, তাদের আচরণে এবং কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়। যাঁরা মমতার হয়ে মমতাকে ন্যায় দেবার জন্য ঘটনার সরেজমিন তদন্ত করতে এসেছিলেন, সেই মহিলা তদন্ত কমিশনও আসলে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিরই অন্য পিঠ। এদের সামনে মমতা অসম্ভব আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক বিপরীত ভাষ্য তৈরি করেছে। তার ধর্ষিতা হবার ব্যাপারে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সে প্রথমে স্বামীকে বলে, - 'পারে নাই গো. বন্ধ কইরা লাইছি'।[৩০] আর দ্বিতীয়বার মহিলা কমিশনের সদস্যদের সামনে বলে, - 'বজ্জাতগুলি, মাইয়া মাইনষেরে..., এর জন্যই তো ডর দেখায় এত। দুই পা এমনে জুড়ছি, আর খুলে না। খুলব না আর কুনোদিন'।[৩১] শেষ বাক্যাংশে সে তোফাজ্জেলকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। ভীষণ জোরালো এই প্রতিবাদ। অবস্থান সম্পর্কে মমতার এই প্রত্যয় এবং ভাষ্য প্রন্তিক মানুষের আইডেনটিটিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

জয়া গোয়ালার *পারবতীয়া* [৩২] গল্পে পারু মানে পারবতীয়া সাঁওতাল আর বাগানের পানিওয়ালা মংলু ঘাটোয়াল সমাজের চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে পালিয়ে গিয়েছিল স্বপ্নের ডেরা বাঁধার জন্য। পারুর মা-বাবা বা সমাজ, কেউ মেনে নেয়নি তাদের দুজনের সম্পর্ক। কারণ সাঁওতাল আর ঘাটুয়ালদের মধ্যে বিবাহে বাধা আছে। তবু তারা সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই গল্পে অপত্য স্নেহের কাছে হেরে গিয়ে পারুর মা-বাবা দুজনেই সমাজের চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে মেয়ের কাছে চলে এসেছিল। তাদের বক্তব্য–

> "সমাজ লে বাহার করলে করবেক। আর পয়সা খরচ করে জাতে নাই উঠব।"[৩৩]

এখানে প্রতিবাদী স্বর স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা একসময় সমাজের ক্ষমতাকেন্দ্রের অংশ ছিল গল্পকার তাদেরকেই প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। অপত্য স্নেহই সেই অনুপ্রেরণা যা তাদের প্রতিরোধী স্বর গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছে। আমরা অনুমান করতে পারি গল্পটি সাঁওতাল সমাজের প্রচলিত নিয়মের অচলায়তনে আঘাত হানার মতো একটি ভাষ্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। লেখকের দিক থেকে এই ভাষ্য নির্মাণ তাঁর রাজনৈতিক প্রেরণার অন্তর্গত। এই প্রয়াস আরও সার্থক হয়ে ওঠে *মজুরী* গল্পে। গল্পটির আলোচনা আমরা আগেই করেছি। সেখানে প্রান্তিকের প্রতিরোধী স্বর ফুটে উঠেছে বিষ্ণুর মধ্যে। বাবুদের খেতে কাজ করার মজুরী বাড়ানোর লড়াইতে সেই তো মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সেই সময় পেরিয়ে এসে বুড়ো বয়সে যখন সে তার ছেলেকে দেখে নির্দ্বিধায় প্রশ্নহীনভাবে বাবুদের বেঁধে দেওয়া মজুরীই নিচ্ছে, তখন তার পুরনো দিনের সংগ্রামের কথা মনে পড়ে। পাঠক অবশ্যই খেয়াল করবেন ক্ষমতাকেন্দ্রের প্রতিরোধী তার উচ্চারণ, -

> "শালা, কেউ হামদের কথা নাই ভাবে – ঠেকার সময় আসবেক – ঠেকা ফুরাইলেই সব খতম। শালা থুঃ।"[৩৪]

তমা বর্মণের *মারীচ রাত্রি* গল্পের কর্তৃস্বর কীভাবে নির্মিত হয়েছে দেখে নিই–

১. মাসির কথা '(খদ্দের) লক্ষ্মী আমাদের। ফেরালে পাপ। তুলতেই হয়।'[৩৫] এখানে মাসি যা বলবে তা সবাই মানতে বাধ্য। পান থেকে চুন খসলে মেয়েদের টাকা কেটে নেন তিনি।

২. মেরে ফেলবে নাকি? কেবল টাকার খাই[৩৬] (মাসির বিরুদ্ধে কৃষ্ণা) এই অবস্থায় বিট্টু, যে তার সন্তান, সেই নতুন ভাবে বাঁচার প্রেরণা দেয় কৃষ্ণাকে। বিট্টুকে এই নরকের আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে অন্য বাতাসে শ্বাস নেবার জন্য সে তার পছন্দের ভায়োলিন কিনে দেয়। বিট্টুকে বাইরের হোস্টেলে রেখে পড়াশোনা করানোর জন্য কৃষ্ণার অনেক টাকা দরকার। তাই নিজে যতই অসুস্থ হোক, কৃষ্ণা সিদ্ধান্ত নিল, উন্মাদ ষাঁড়গুলো এলে দাঁতে-দাঁত চেপে সে টাকা নেবে। ছুটকা বা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গোণাগুনতি নয়। 'সোজা হিসাব – রোজ এত টাকা ফেলব, আমার এত'।[৩৭] এইভাবে মাসির প্রচলিত নিয়ম ভেঙে মৃত্যু পথযাত্রী কৃষ্ণার উচ্চারণ তার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে।

মেঘমালা দে মহন্তের *সালেমা বেগমকে নিয়ে দু-চারটি মামুলি ফিসফিসানি* গল্পে প্রতিবাদী স্বরটি সালেমারই। মুখ্য কর্তৃত্বকামী স্বর এখানে ব্যক্তি বিশেষের নয় বরং রাষ্ট্র ব্যবস্থার। কারণ রাষ্ট্রই তাকে ও তার স্কুল শিক্ষক বাবাকে বিদেশি হবার নোটিস ধরিয়ে জেল বা ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী করেছে। রাষ্ট্রই তাকে অপাংক্তেয় করেছে। তবু দু-একটি আঁচড়ে লেখক জেলের ভেতরকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের কথা বলেছেন এবং দু-চারটা জেল ঘুরে আসার সুবাদে সালেমা যে সেবিষয়ে অজ্ঞ থেকেছে অথবা নীরবে মেনে নিয়েছে তা নয়। নিগৃহীত হতে হতে একসময় কিছুই না হারানোর সাহস জেগেছে তার মনে। জেলের অন্ধকারে একটি শক্ত লোমশ পুরুষালি হাত তার বুকের বাঁদিকে খামচে ধরলে সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করে আর গালাগাল দেয় 'শালা কুত্তা' বলে। অবশ্য ক্ষমতাকেন্দ্র ইতিমধ্যে তাকে 'বেশ্যা', 'রেন্ডি' হিসাবেই চিহ্নিত করেছে। যেহেতু সালেমা বা তার বাবাকে রাষ্ট্রযন্ত্র বিদেশি বা রিফিউজি হিসাবে চিহ্নিত কেন করল তার প্রেক্ষিত সম্পর্কে লেখক মৌন থেকেছেন এবং পাঠককে শুধু এটুকুই জানিয়েছেন যে, ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকাকালীন সালেমাদের গ্রামের ছোট্ট ভিটেটা হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে জন্ম নেওয়া চাচাত ভাই দখল করে নিয়েছে, সেই হেতু এটা নিশ্চিত যে তাকে এই নিপীড়িত অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে প্রথমত কোনো আধিপত্যকামী অপশক্তি এবং দ্বিতীয়ত আইনের বেড়াজাল। তাই সালেমার প্রতিবাদ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে যতটা তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে জানে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে শারীরিক ভাবে মুক্তি পেলেও সমাজ তাকে অপাংক্তেয়ই করে রাখবে। জেলের ভেতর একমাত্র চাঁপা গাছটিই ছিল তার আশ্রয়, কিন্তু সেও নীরব ঝলসানো বৃক্ষপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে – অন্তত সালেমার চারপাশের ক্ষমতাতান্ত্রিক কঙ্কালসার সমাজটার মতোই। তাই সালেমা শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রতন্ত্রের বিপরীত ভাষ্য তৈরি করে – তাকে চিরদিনের জন্য অপাংক্তেয় করে দিয়ে আপাত মুক্তির যে সরকারি ব্যবস্থা তাকেই অস্বীকার করে নিরাভরণ হয়ে যায়। বিমানবায়নের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধী স্বর বেশ জোরালো। নিরালম্ব প্রান্তিক অবস্থানে থাকতে থাকতে তার যে অভিজ্ঞতা হয়, তাতে অবলীলায় সে বলতে পারে, -

> "শালা সব ব্যাটাইন এক। চুপ মারি মজা দেখের। ঘরবাড়ি নাই, এতিম মেয়েমানুষ পথে পথে ঘুরলে খুব মজা।"[৩৮]

ঝুমুর পাণ্ডের *শ্রীমতী চলে* [৩৯] গল্পে জগৎ বাউড়ির মেয়ে, শ্রীদামের বউ শ্রীমতী প্রতিরোধী স্বর গড়ে তোলে পারস্পরিক বিশ্বাসের জায়গায় আঘাত লাগায়। স্বামীর প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা। সুধন্য ও ভতু ডাকাতের মতো প্রবল প্রতিপক্ষকে সে ভয় পায়নি, কারণ তার সঙ্গে ছিল শ্রীদামের ভালোবাসা। তার ওপর কুনজর পড়েছিল ভতু ডাকাতের। শ্রীদাম তখন আত্মরক্ষার জন্য শ্রীমতীকে দা ব্যবহারের কথা বলেছিল। শ্রীমতী স্বামীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ভতুকে খুনের দায়ে জেলে যায়। তার চার বছরের জেল হয়। নিজের সতীত্ব আর স্বামীর ভালোবাসার ওপর নির্ভর করেই বন্দীজীবন পার করে শ্রীমতী। কিন্তু সেই অবসরে শ্রীদাম দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলে। জেল থেকে ফিরে এসে সেকথা জানতে পেরে শ্রীমতী স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে। লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীমতী থুঃ করে কতকটা থুতু ফেলেছে স্বামীর উদ্দেশ্যে।

বিজয়া দেবের 'রুচিরার দিনরাত্রি' গল্পটিতে কীভাবে প্রান্তিক স্বর তৈরি হয়েছে তা আমরা দেখিয়েছি। এখানে গল্পের শেষদিকে এসে খুব স্বষ্টভাবেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ফুটে উঠতে দেখা গেছে। হেডমাস্টারের কাছ থেকে রুচিরা একটা প্রেরণা পেয়েছিল। তিনি রুচিরাকে সাবধান করতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন, -

> "যদি সাহস দেখাতে পারো ভালো। তা তো পারবে না। তাহলে ফালতু হাসির মানে কী?"[৪০]

এই বাক্যের প্রথম অংশটি রুচিরাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল তার বাড়িতে যে ক্ষমতাকেন্দ্র আছে তার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে। সুতরাং স্কুলের কাজ সেরে বাড়ি ফিরেই সে যখন নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয় তখন সেই আত্মবিশ্বাসে ভর করে সে বিনায়ককে বলেছিল, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। তোমাদের একটা কথারও আমি জবাবদিহি করব না।' লেখকের *দহন* [৪১] গল্পে ঠিকে কাজের ঝি কাজলরাণীর প্রতিবাদী স্বর ফুটে উঠেছে রায়বাড়ির কাজ ছেড়ে দেওয়ার ভেতর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিয়ে এবং পরে মেয়ে মানিকে বাঁচাতে কাটারি হাতে রুখে দাড়ানোর মধ্যে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা কর্তৃত্বকামী স্বরকে সে প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখতে পেয়েছিল। আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে কাজল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। লেখক বিভিন্ন গল্পেই এই ধরনের প্রান্তিক চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রতিরোধী স্বর ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

শর্মিলা দত্তের *ফিউডাল চেয়ার* [৪২] গল্পের গৃহবধূ তৃণা এখানে প্রান্তিক চরিত্র। স্বামী অংশুমান প্রাতিষ্ঠানিক সত্তা নিয়ে তৃণার সামনে দাঁড়িয়ে। যে কর্তৃত্বকামী সত্তা তৃণার দাদু-ঠাকুরমা-বাবা হয়ে অংশুমানের মধ্যে বর্তেছিল, তার শিকড় ছেলে অঞ্জনের চৈতন্যেও ছড়িয়ে গেছে। অংশুমান বিয়ের যৌতুক হিসাবে পেয়েছিলেন মেহগনি কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার। এর কারুকাজ যেমন অতুলনীয় তেমনি ক্ষমতার চিহ্ন হিসাবেও অনুপম। এই চেয়ারে বসেই দাদু-ঠাকুরমা-বাবা সংসারের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেছিলেন। সংসারকে ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধতে পারেননি। মেহগনি কাঠের তৈরি আরও একটি খাট তৃণা অংশুমানের আপত্তি সত্তেও সামসুলকে দান করে দিয়েছিলেন। তাতে তৃণার মনে হয়েছিল পরিবারের মধ্যে আধিপত্যের যে সুর চারিয়ে গিয়েছিল, তা কিছুটা খর্ব হবে। চেয়ারটিকেও তৃণা স্মৃতি হিসাবে বহন করতে চাননি। কারণ সেটা ক্ষমতাকেন্দ্রের প্রতীক। বাবা-দাদু-ঠাকুরমার মতো তাঁর ছেলে-মেয়ে দুটির মধ্যে আধিপত্যবাদী মনোভাব জারিত হোক, তা তিনি চাননি। তাই ওই চেয়ারটাকে ঘরের বাইরে রোদজলে রেখে দেন। যে সংসার তাঁকে ভালোবাসা দেয়নি, সেই সংসারের অহমিকার চিহ্নকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমেই তৃণার প্রতিবাদী স্বর ফুটে উঠেছে।

মঞ্জরী হীরামণি রায়ের *কুরবানি* [৪৩] গল্পে কর্তৃত্বকামী স্বর আছে ফিরোজের আর কিছুটা সাবিনার শাশুড়ির। কলেজের শিক্ষক হয়েও ফিরোজ অথবা তাঁর মা অচলায়তন অটুট রাখার পক্ষপাতী। যেমন, তাবিজ-কবচে বিশ্বাস, কুরবানি, পুত্র সন্তানের চাহিদা ইত্যাদি। বিয়ের পর বছর পেরিয়ে গেলে শাশুড়ি সাবিনাকে তাবিজ-কবচে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। ফিরোজও নিজের কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে সাবিনাকে পুজোর তিনদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দ করতে দেয় না, তাকে হিজাব পরতে বাধ্য করে আর সংসারের খাই-খরচ সাবিনার ওপর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু সাবিনা অচলায়তনকে ভাঙতে চায়। তাবিজ-কবচে সে অবিশ্বাস করে। এ-প্রক্রিয়ায় চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার পাবে বলে সে মনে করে না বলেই থানায় এফ.আই.আর করেছে আর নতুন সিম নিয়েছে। ফিরোজের দাবি সত্ত্বেও কুরবানির টাকা সে কেন দেবে, সেই প্রশ্ন তুলেছে। গল্পের শেষে সাবিনা নিজের নামে কুরবানি দিতে অস্বীকার করেছে এই বলে যে, ফিরোজের সংসারে এসে তার সমস্ত জীবনটাই কুরবানি দেওয়া হয়ে গেছে। এইভাবে প্রতিবাদী স্বরের উচ্চারণে সাবিনা অচলায়তনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই গল্পে একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে ফিরোজের সমকামী হওয়ার প্রসঙ্গ। স্বামীর সমকামিতা যেদিন প্রথম সাবিনার কাছে ধরা পড়ল সেদিন ফিরোজের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ একবার মাত্র 'ছিঃ' উচ্চারণ আর সশব্দে জানালা বন্ধ করায় প্রকাশ পেয়েছিল। তারপর শাশুড়ি ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে এলে সাবিনা তাঁকেও প্রতিহত করেছিল এই বলে, -

"আপনে ইখান তনে যান। আমরার মাত আমরাউ মাতমু।"[৪৪]

বান্ধবী মিতুল যতই তথ্য সহযোগে সমকামিতাকে সহানুভূতি দেখাক, যতই আইনের পথে চলার পরামর্শ দিক, সাবিনার কাছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনটাই বড়ো। সেখানে ফাটল ধরায় সে ফিরোজকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই প্রত্যাখ্যানের পেছনে মূল অনুপ্রেরণা ছিল শিক্ষার এবং অর্থনৈতিক অবলম্বনের। সেটাই সাবিনাকে জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

উত্তরপূর্বের নির্বাচিত নারীপাঠে নিম্নবর্গের নির্মাণ বিষয়ক আলোচনায় আপাত বিরতি। এ আলোচনা দীর্ঘায়িত হতেই পারে। তবে এটা নিশ্চিত যে এখানকার লিখনবিশ্বে প্রান্তিক বা অন্তেবাসী মানুষ জায়গা করে নিয়েছেন। লেখকেরা একনিষ্ঠ থেকেছেন প্রান্তিক মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে পাঠকের দরবারে নিয়ে আসতে। প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক বিভিন্ন গল্পে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। প্রতিরোধ নিম্নবর্গ চেতনার একমাত্র উপাদান – স্বভাবতই এটা লেখকেরা মনে করেননি। তাই আমাদের আলোচিত সব নারীপাঠেই প্রতিরোধী স্বর স্পষ্ট নয়। বরং প্রান্তিক মানুষ কীভাবে প্রতাপচক্রের কৃৎকৌশলের কাছে আত্মসমর্পণ করে বা যাবতীয় প্রত্যয় সত্ত্বেও অনুগত হয়ে ওঠে, শাসক ও শাসিতর দ্বৈত সম্পর্কে কীভাবে নিম্নবর্গ হিসাবে চিহ্নিত হয়, কীভাবেই বা এই নিম্নবর্গীয় নীরবতার ভূমিকা জোরালো হয়ে ওঠে – নির্বাচিত পাঠ অবলম্বনে আমাদের বর্তমান আলোচনা আসলে তারই প্রতিবেদন।

Reference:

১. জয়া গোয়ালা রচনা সমগ্র (২০১৯), মুখাবয়ব, ত্রিপুরা, পৃ. ৯১৭-৯৩০

২. তদেব, পৃ. ৯২০

৩. জীবনের নামতা (২০০৯), অক্ষর প্রকাশন, পৃ. ৭-১৩

৪. চট্টোপাধ্যায়, অনুপ ও শুভব্রত দেব (সম্পা.) (২০০১), উত্তরপূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প, অক্ষর পাবলিকেশনস্, পৃ. ৩১৮-৩২৩

৫. তদেব, পৃ. ৩২১

৬. চট্টোপাধ্যায়, সাধন ও শ্যামল ভট্টাচার্য (সম্পা.) (১৯৯৮), প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার, উবুদশ, পৃ. ১০২-১০৭

৭. জুম গল্প সংকলন (২০০৮), স্রোত প্রকাশনা, পৃ. ৬০-৬৪

৮. তদেব, পৃ. ৩০-৩৪

৯. ভট্টাচার্য, মৃদুলা (সম্পা.) (২০১৮), সৃজনী ষান্মাষিক সাহিত্য পত্রিকা, পৃ. ১৮-২১

১০. তদেব, পৃ. ২০

১১. দত্ত, অখিল (সম্পা.) (২০০০), পূর্বদেশ গল্পপত্র, পৃ. ১৪-২০

১২. গেরাম থানের মানুষটা ও দুলিয়া (১৯৯৭), কফিহাউস প্রকাশনী, পৃ. ১৮-২১

১৩. সেনগুপ্ত, অমিতাভ (সম্পা.) (২০১৬), ঈশান, পৃ. ৬৯-৭৫

১৪. দত্ত, চন্দ্রিমা (সম্পা.) (২০১৫), মানবী নবম সংখ্যা, পৃ. ৪৩-৪৭

১৫. অন্তর্গত রক্তের ভেতর (২০১৯), যাপনকথা প্রকাশন, পৃ. ৫২-৫৭

১৬. তদেব, পৃ. ৩৬-৪৬

১৭. তদেব, পৃ. ৯৩-৯৭

১৮. নন্দী, কান্তারভূষণ (সম্পা.) (২০২২), যাপনকথা নবম সংখ্যা, পৃ. ১৬৩-১৭২

১৯. নাথ, আশিসরঞ্জন (সম্পা.) (২০২১), প্রবাহ ৩৪/২, পৃ. ১৪২-১৪৯

২০. পূর্বোল্লিখিত ঈশান (২০১৭), পৃ. ৬৮-৭১

২১. পূর্বোল্লিখিত প্রবাহ (২০২১), পৃ. ৩৭-৪০

২২. মন্দারবৃক্ষ (২০১৯), তুলসী পাবলিশিং হাউস, পৃ. ১১-১৬

২৩. তদেব, পৃ. ১৬

২৪. সাহা, তুষার কান্তি (সম্পা.) (২০১৩), মজলিশ সংলাপ : জুলাই-সেপ্টেম্বর, পৃ. ২৬-৪০

২৫. পূর্বোল্লিখিত, (২০২৩), পৃ. ২৮-৩৩

২৬. তদেব, পৃ. ৩১

২৭. পূর্বোল্লিখিত, (২০১৪), যাপনকথা, পৃ. ৮০-৮৩

২৮. ভট্টাচার্য, শিখা (সম্পা.) (২০২৪), সাহিত্য ১৬৪ : ডিসেম্বর, পৃ. ৯০-৯৬

২৯. পূর্বোল্লিখিত উত্তরপূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প, পৃ. ৩২১

৩০. ঐ : পৃ. ৩২২

৩১. ঐ, পৃ. ৩২৩

৩২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৯৫-৬১২

৩৩. ঐ, পৃ. ৬১২

৩৪. তদেব

৩৫. পূর্বোল্লিখিত, (২০২১), প্রবাহ ৩৪/১, পৃ. ১৪৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 73 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩৬. ঐ, পৃ. ১৪৪

৩৭. ঐ, পৃ. ১৪৯

৩৮. পূর্বোল্লিখিত, যাপনকথা, নবম সংখ্যা, পৃ. ১৭১

৩৯. দত্ত, রাধা (সম্পা.) (২০০১), পূর্বদেশ গল্পপত্র, পৃ. ২০-২৭

৪০. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৫

৪১. নীলাঞ্জনা (২০০৩), এবং মুশায়েরা, পৃ. ৭৫-৮০

৪২. পূর্বোল্লিখিত, (২০১০), পূর্বদেশ গল্পপত্র, পৃ. ১০৫-১১১

৪৩. পূর্বোল্লিখিত, (২০১৬), যাপনকথা ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৪৮-১৫৭

৪৪. ঐ, পৃ. ১৫৩-৫৪